

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট থেকে বের হওয়ার পথ কী?

বর্তমান জ্বালানিসংকটের মূল কারণ গ্যাস সরবরাহের স্বল্পতা। এই ঘটতি হঠাৎ তৈরি হয়নি। ২০১১-১২ সাল থেকেই পেট্রোবাংলা গ্যাস আমদানিনির্ভর পরিকল্পনা গ্রহণ করে আসছে। ২০১৬-১৭ সালে নিজস্ব উৎস (পেট্রোবাংলা ও আইওসি মিলিয়ে) থেকে গ্যাসের উৎপাদন যেখানে ২৭০ কোটি ঘনফুটে পৌঁছেছিল, সেটা এখন কমে প্রায় ১৫০ কোটি ঘনফুটে এসে ঠেকেছে। এটা পেট্রোবাংলার অনেক বড় একটা ব্যর্থতা।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকার নিজস্ব উৎস থেকে গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনের ব্যাপারটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব না দিয়ে ক্রমেই আমদানিনির্ভর হয়ে উঠেছিল। তাদের পরিকল্পনার অন্যতম অংশ ছিল ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (এফএসআরইউ) এবং ল্যান্ড-বেজড রিগ্যাসিফিকেশন প্ল্যান্ট স্থাপন। এখন দেখা যাচ্ছে, এর কোনোটিই প্রত্যাশামাফিক কার্যকর হয়নি।

মহেশখালীতে আমাদের মাত্র দুটি এফএসআরইউ রয়েছে। এর ফলে অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে প্রয়োজন অনুযায়ী বাইরের উৎস থেকে গ্যাস আমদানি করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে নিজস্ব উৎস থেকে গ্যাস উৎপাদন বাড়ানোর জন্য গত ১০-১১ বছরে যেসব উদ্যোগ ও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, সেগুলোও কাজক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

এখন প্রশ্ন হলো, এই পরিস্থিতি থেকে আমরা কীভাবে বের হয়ে আসতে পারি? খুব দ্রুত বর্তমান সংকট থেকে বের হওয়ার কোনো সহজ সমাধান নেই। নিজস্ব গ্যাস উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত মোটামুটি ‘বাপেক্স অনলি’ নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। বাপেক্সের ওপর নির্ভর করেই আমরা আশা করেছি, অন্তত একটি পর্যায় পর্যন্ত উৎপাদন ধরে রাখা সম্ভব হবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, প্রতিবছরই ১০০-২০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের উৎপাদন কমছে।

এই উৎপাদন হ্রাসের প্রবণতা ঠেকাতে আরও আগেই কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন ছিল। এখন বাপেক্সের যেসব উদ্যোগ কাজক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি, সেগুলো নতুন করে পর্যালোচনা করা দরকার।

আমরা যে পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণ করছি, বিশেষ করে কারিগরি বিশ্লেষণ, তা মূলত বাপেক্সের অভ্যন্তরীণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সক্ষমতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত তৃতীয় পক্ষের মতামত নেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে

যেসব গ্যাসক্ষেত্রে উৎপাদন ক্রমেই কমছে, সেগুলোর উন্নয়ন এবং উৎপাদন ধরে রাখার বিষয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অভিজ্ঞ কোম্পানিকে পরামর্শক হিসেবে কাজে লাগানো যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, শেভরন দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে গ্যাস উৎপাদন করে আসছে। দেশের গ্যাস সরবরাহ দ্রুত বাড়তে শেভরনের সক্ষমতা ও অভিজ্ঞতাকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, সেটিও বিবেচনা করা উচিত। এ ক্ষেত্রে তাদের দীর্ঘদিনের স্থানীয় অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অপারেশনাল সক্ষমতাও তাদের আছে।

এসব উদ্যোগ এখন গ্রহণ করলেও ফল পেতে ছয় মাস থেকে এক বছর সময় লেগে যেতে পারে। ফলে বর্তমান সংকট সামাল দিতে আমাদের এখনই বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের সুযোগগুলো বিবেচনা করতে হবে।

প্রথমত, বাসাবাড়িতে এলপিগ্যাসের ব্যবহার বাড়ানো যেতে পারে। প্রাকৃতিক গ্যাসের সবচেয়ে সরাসরি বিকল্প জ্বালানি হলো এলপিগ্যাস। অবশ্য প্রাকৃতিক গ্যাস ও এলপিগ্যাস—দুটিই আমদানিনির্ভর হওয়ায় উভয় ক্ষেত্রেই বৈদেশিক মুদ্রার ওপর চাপ রয়েছে। অর্থাৎ এলএনজি আমদানিতে যেমন বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়, এলপিগ্যাস আমদানিতেও একই ধরনের চাপ তৈরি হয়। তবে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো, এলপিগ্যাস আমদানির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো আমাদের ইতিমধ্যে রয়েছে। বর্তমানে আমরা প্রায় ১ দশমিক ৫ মিলিয়ন টন এলপিগ্যাস আমদানি করছি, অথচ বিদ্যমান অবকাঠামোর মাধ্যমে প্রায় ৩ মিলিয়ন টন পর্যন্ত আমদানির সক্ষমতা রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, যানবাহনে সিএনজির বিকল্প হিসেবে অটোগ্যাসের ব্যবহার বাড়ানো যেতে পারে। কিছু শিল্পেও এলপিগ্যাসের ব্যবহার সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে যেসব শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের মোট ব্যয়ের তুলনায় জ্বালানি ব্যয়ের অংশ তুলনামূলকভাবে কম, সেসব ক্ষেত্রে এলপিগ্যাস ব্যবহার করা যেতে পারে। ইতিমধ্যে অনেক শিল্প উদ্যোক্তা নিজেদের উদ্যোগে এলপিগ্যাস ব্যবহার শুরু করেছেন।

তৃতীয়ত, গ্যাস চুরি বন্ধে দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। আমাদের প্রতিদিন প্রায় ২০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস চুরি হচ্ছে, মূলত অবৈধ সংযোগের মাধ্যমে। গ্যাস এখন আমাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান একটি জ্বালানি, অথচ তা অব্যাহতভাবে চুরি হয়ে যাচ্ছে। গ্যাস চুরি বন্ধ করা সম্ভব হলে প্রকৃত ব্যবহারকারীদের সরবরাহ কিছুটা বাড়ানো সম্ভব হবে। তবে সমস্যাটি এত ব্যাপক যে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পরও অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো দ্রুত পুনঃসংযোগ করা হয়। তাই ধারাবাহিক নজরদারি নিশ্চিত করা গেলে গ্যাস চুরি ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব।

কোন জ্বালানি কোন খাতে, কোথায় এবং কী পরিমাণ ব্যবহার করা হবে—এ বিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে। ব্যাটারিচালিত রিকশা, ইভি গাড়ি থেকে শুরু করে শিল্প ও বাসাবাড়িতে ভবিষ্যতে জ্বালানির চাহিদা কী হবে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জ্বালানি সংমিশ্রণ কেমন হবে—এসবের একটি সমন্বিত ও বাস্তবসম্মত চিত্র তৈরি করা জরুরি।

গ্যাসকে কেন্দ্র করে জ্বালানি খাতে যে সংকট তৈরি হয়েছে, এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করলে হয়তো কিছুটা স্বস্তি মিলবে; কিন্তু এতে পুরো সংকটের সমাধান হবে না। আমাদের গ্যাসের সর্বোচ্চ ব্যবহার হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে। গ্যাস সরবরাহ কমে যাওয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদনও কমছে এবং লোডশেডিং বাড়ছে। এ অবস্থায় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর সর্বোচ্চ উৎপাদন সক্ষমতা কাজে লাগানো প্রয়োজন। পাশাপাশি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের ওপর নির্ভরতা আরও কিছুটা কমবে।

জ্বালানি খাতে আমরা দীর্ঘদিন ধরে একধরনের ‘ফায়ার ফাইটিং’ পদ্ধতিতে কাজ করছি অর্থাৎ আপৎকালীন ব্যবস্থার মাধ্যমে একের পর এক জরুরি সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি। এ কারণে মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে জ্বালানির চাহিদা সঠিকভাবে নিরূপণ করা।

কোন জ্বালানি কোন খাতে, কোথায় এবং কী পরিমাণ ব্যবহার করা হবে—এ বিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে। ব্যাটারিচালিত রিকশা, ইভি গাড়ি থেকে শুরু করে শিল্প ও বাসাবাড়িতে ভবিষ্যতে জ্বালানির চাহিদা কী হবে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জ্বালানি সংমিশ্রণ কেমন হবে—এসবের একটি সমন্বিত ও বাস্তবসম্মত চিত্র তৈরি করা জরুরি

নবায়নযোগ্য জ্বালানি, কয়লা, গ্যাস ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ—এই বহুমুখী জ্বালানি সংমিশ্রণের ভিত্তিতেই আমাদের এগোতে হবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান উৎস সৌরবিদ্যুৎ। কত বেশি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব, তা গ্রিডভিত্তিক হোক বা অফ-গ্রিড—এসব বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা প্রয়োজন। সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে ১০ হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। তবে ৫ হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারলেও সেটি একটি বড় অর্জন হবে। গ্রিড ও রুফটপ—দুই ধরনের সৌরবিদ্যুতের সমন্বয়ের মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।

কয়লার ক্ষেত্রেও আমাদের নিজস্ব উৎস রয়েছে, কিন্তু সেটিও যথাযথভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। বড়পুকুরিয়ায় ৫২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা থাকলেও মূলত ২২৫ মেগাওয়াটের একটি বিদ্যুৎকেন্দ্রই চালু থাকে। অন্য দুটি বিভিন্ন কারিগরি ও যান্ত্রিক সমস্যার কারণে সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। বর্তমানে আমাদের বছরে ১৮-২০ মিলিয়ন টন কয়লা প্রয়োজন হয়। অথচ বড়পুকুরিয়া থেকে বছরে মাত্র প্রায় ১ মিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদন করা সম্ভব।

জ্বালানি খাতে আমাদের আমদানিনির্ভরতা থেকেই যাবে। তাই নিজস্ব কয়লা উৎপাদনের সম্ভাবনাও নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার। জ্বালানি খাতে আত্মনির্ভরতা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্যই কয়লার মতো জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবেশগত সংবেদনশীলতার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। তবে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বিসর্জন দিয়ে যদি পরিবেশের বিষয়টিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহলে দেশ আরও পিছিয়ে পড়বে। আর এর ফলে বাস্তবে পরিবেশের ওপর আরও বেশি নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

দীর্ঘ মেয়াদে জ্বালানি খাতে আঞ্চলিক সহযোগিতার দিকেও আমাদের এগোতে হবে। ইন্টারকানেক্টিভিটি গড়ে উঠলে নেপাল, ভুটান, ভারত ও মিয়ানমারে উৎপাদিত অতিরিক্ত বিদ্যুৎ আমদানির সুযোগ তৈরি হবে।

জ্বালানি সাশ্রয়ের ক্ষেত্রেও সামগ্রিক দক্ষতা বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। গ্রমের সময়ে যে ব্যাপক লোডশেডিং হচ্ছে, তার অন্যতম প্রধান কারণ ফ্যান ও এয়ারকন্ডিশনারের অতিরিক্ত ব্যবহার। আমাদের দেশে অধিকাংশ এয়ারকন্ডিশনার এখনো ইনভার্টার প্রযুক্তির নয়। ইনভার্টারযুক্ত এয়ারকন্ডিশনার ও রেফ্রিজারেটর ব্যবহার করা হলে ২০ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা সম্ভব।

সর্বোপরি, শুধু একটি পদক্ষেপের মাধ্যমে জ্বালানিসংকটের সমাধান করা সম্ভব নয়। এসব উদ্যোগকে একটি সমন্বিত ও সম্মিলিত কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে একসঙ্গে বাস্তবায়ন করতে হবে। তা না হলে দৃশ্যমান স্বস্তি বা ‘ভিজিবল রিলিফ’ পাওয়া সম্ভব হবে না।

● **ম. তামিম:** উপাচার্য, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (আইইউবি)